বন্দুকযুদ্ধে উন্মোচিত জীবন অথবা 'বাংলাক্যাম্প'

পারভেজ আলম

ইব্রাহিমি ধর্মীয় ঐতিহ্য মোতাবেক পৃথিবীর প্রথম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন আদমপুত্র হাবিল, তাঁর ভাই কাবিলের হাতে। হত্যার কারণ হিসেবে হিংসার কথা বলা হয়। হাবিল ও কাবিল উভয়েই আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবানি দিয়েছিলেন। হাবিল দিয়েছিলেন পশু কোরবানি, কাবিল দিয়েছিলেন শস্য। আল্লাহ হাবিলের কোরবানি গ্রহণ করলেন, কিন্তু কাবিলের কোরবানি গ্রহণ করলেন না। এতে হিংসার বশবর্তী হয়ে হাবিলকে খুন করলেন কাবিল। ইহুদিদের মিদ্রাস এবং মুসলমানদের কোরআনের বিভিন্ন তাফসির ও সিরাত গ্রন্থ মোতাবেক কোরবানি কবুল হওয়ার সাথে পছন্দের নারীকে বিয়ে করার সুযোগের সম্পর্ক ছিল, আর সেটাই হিংসার প্রধান কারণ। আল থালাবি, আল তাবারি প্রমুখের লেখা সিরাত মোতাবেক এই পছন্দের নারী কাবিলের যমজ বোন আকলিমা।[১] থালাবির বর্ণনা মতে, কাবিল ও আকলিমা উভয়েরই জন্ম বেহেশতে। সুতরাং কাবিল আকলিমাকে শুধু তাঁর উপযুক্ত মনে করতেন, হাবিলের উপযুক্ত নয়, যার জন্ম দুনিয়ায়। অন্যদিকে জাফর আল সাদিকের (তিনি অজাচার থেকে মানবজাতির জন্মের কাহিনি মানতে পারেননি) মতে, এই পছন্দের নারী হলেন একজন হুর, যাঁর নাম তারাকাহ।[২] তারাকাহ হোক বা আকলিমা, লড়াই এখানে একজন বেহেশতি নারীর জন্য। হত্যাকাণ্ডের কারণ যা-ই হয়ে থাক না কেন, পৃথিবীর প্রথম এই হত্যাকাণ্ডের কোন বিচার হয়েছে কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তাওরাত মোতাবেক, আল্লাহ কাবিলকে বহিষ্কার করেছিলেন। বহিষ্কার করা একটি শাস্তি বটে, যদি আপনি প্রাচীন দুনিয়ার কথা হিসাব করেন তাহলে তা খুবই কঠিন শাস্তি। গোত্র বা নগর থেকে বহিষ্কৃত ব্যক্তির যেহেতু কোন নিরাপত্তা ছিল না, তাই বহিষ্কার আর মৃত্যু ছিল সমান। তাওরাতে কাবিলকে তাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়–"এই শাস্তি আমার সহ্যের বাইরে।...পলাতক হয়ে যখন আমি দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াব তখন যার সামনে আমি পড়ব সে-ই আমাকে খুন করতে পারে" (পয়দায়েশ ৪:১৩, ১৪)। তাই দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ কাবিলকে একটি নিরাপত্তার চিহ্ন দিয়ে দিলেন, যাতে তাঁকে কেউ হত্যা না করে। এবং ঘোষণা দিলেন–যে তোমাকে খুন করবে তার ওপর সাতগুণ প্রতিশোধ নেয়া হবে (পয়দায়েশ ৪:১৫)। সুতরাং তাওরাতে কাবিলের বহিষ্কারকে নিশ্চিতভাবে শাস্তি বলা যাচ্ছে না। বরং দেখা যায় যে এরপর কাবিল একজন নগর প্রতিষ্ঠাকারী ও জাতির পিতায় পরিণত হন। তাওরাতের কাবিল তাই একজন সার্বভৌম শাসক চরিত্র।

সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা, সম্রাট কিংবা আধুনিক রাষ্ট্রের সহিংস হওয়ার বৈধতা থাকে, এমনকি প্রয়োজনে হত্যাকাণ্ড সংঘটনেরও। সার্বভৌমের হত্যাকাণ্ড বৈচারিক হত্যাকাণ্ড। সাধারণত সুনির্দিষ্ট আইন মেনে ও বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র কাউকে হত্যা করে। সাধারণত বলছি, কারণ এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রম অবস্থা বা জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া ছাড়াই রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, নাগরিক ইত্যাদি নিরাপত্তার অজুহাতে বিচারবহির্ভূতভাবেও হত্যা করতে পারে। আগের কালে রাজা-বাদশাহরা কাউকে খুন করলেও সেটা বৈচারিক হত্যাকাণ্ড ধরা হত, তবে অন্তত খুনের পরে হলেও হত্যার পক্ষে অজুহাত অথবা রায় দেয়ার প্রয়োজন পড়ত। আধুনিক রাষ্ট্রে, যেমন–বর্তমান বাংলাদেশে, পুলিশ বা র‍্যাব বন্দুকযুদ্ধের বিবৃতি দেয়ার মাধ্যমে বিচারবহির্ভূত হত্যার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে। কাবিলের হাতে হাবিলের হত্যাকাণ্ডটি বৈচারিক হত্যাকাণ্ড হতে পারত, যদি কাবিল এই হত্যাকাণ্ডের সময় একজন সার্বভৌম থাকতেন। কিন্তু ঘটনা তা নয়। হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী সময়ে কাবিলের একজন সার্বভৌম চরিত্রে পরিণত হওয়াটা তাই তাঁর বিচারবিহর্ভূত হত্যাকাণ্ডের বৈধতার মিথিক্যাল বিবৃতি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বাংলাদেশের র‍্যাব অথবা পুলিশদের বিবৃতিগুলোও এক ধরনের মিথিক্যাল বিবৃতি। যা হোক, কাবিল যদি খুন করার সময় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর হাতে হাবিলের হত্যাকাণ্ডটি কি একটি হোমিসাইড গণ্য করা হবে? ইব্রাহিমি ঐতিহ্যে এই হত্যাকাণ্ডের যত কাহিনি প্রচলিত আছে, বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যে মতামত দিয়েছেন, তাতে এই প্রশ্নের সহজ ও সরাসরি উত্তর পাওয়া যায় না। আগামবেনের মতে, 'সহিংসতা' হল বিচার ব্যবস্থার আদি ভিত্তি।[৩] সেই সাথে সার্বভৌমের ক্ষমতা আসলে আইনের ভেতরে বা বাইরে নয়; বরং বৈধ ও অবৈধ সহিংসতা, কিংবা বৈধ অথবা অবৈধ হত্যাকাণ্ড যেই দোরগোড়ায় একাকার হয়ে যায় সেই অবিচ্ছেদের এলাকায় বিরাজ করে। একই সাথে আইনের ভেতরে ও বাইরে থাকার এই প্যারাডক্সকে আগামবেন ব্যাখ্যা করেছেন এই বাক্যের মধ্যে : "আমি, সার্বভৌম, যিনি আইনের বাইরে, ঘোষণা করছি যে আইনের বাইরে কিছু নাই"।[৪] সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাই ঘটেছে সকল জীবনকে তার কাছে সম্ভাব্য হত্যাকাণ্ডের জন্য উন্মুক্ত জীবন হিসেবে গ্রেপ্তার করার মাধ্যমে। কাবিল চরিত্রটি সার্বভৌম ক্ষমতার সেই দোরগোড়ায় অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে, যা বিচার ব্যবস্থার আদি ভিত্তিও বটে।

> অর্থাৎ কোরআন অনুসারে, হাবিলের মতে কাবিল এই দুনিয়ায় শাস্তির মুখোমুখি না হলেও আল্লাহর বিচারে তার গন্তব্য হবে দোজখের আগুন। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত র‍্যাবের হাতে একরামুল হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর স্ত্রীকে র‍্যাবের সদস্যরা আল্লাহর কাছে বিচার দেয়ার জন্য বলেছিলেন বলে খবরে প্রকাশ পেয়েছিল।

কিন্তু খুন হওয়া হাবিলের কী হবে? তাঁর খুনের বৈধতা নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে না আসা গেলেও তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলেই ইব্রাহিমি ঐতিহ্যে মনে করা হয়। ধর্মীয় পণ্ডিতরা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল। এই খুন 'অন্যায়' হলেও তাকে আইনগতভাবে 'অপরাধ' হিসেবে চিহ্নিত করা কঠিন, অথচ অন্যায়-অপরাধ আমরা একযোগে উচ্চারণ করি এমনভাবে যেন বা এ দুই একই। নীতিশাস্ত্র আর আইনশাস্ত্র পরস্পরের ওপর নির্ভর করলেও এক বিষয় নয়। কাবিলের হাতে হাবিলের খুন তাই ইব্রাহিমি ধর্মতাত্ত্বিকদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল এমন এক অবস্থার সামনে, যাকে দেরিদার ভাষায় বলা হয় 'আনডিসাইডেবিলিটি', মানে যখন আর ভাল বনাম মন্দ অপরাধ বনাম নিরপরাধ এই রকম বাইনারি দিয়ে অর্থ উৎপাদন করা যায় না। এই আনডিসাইডেবিলিটি অতিক্রম করার জন্য সাধু অগাস্টিন প্রস্তাব করেছেন যে আল্লাহ কাবিলকে দিয়েছেন এই দুনিয়ার নগর আর হাবিলের জন্য খুলে দিয়েছেন খোদ 'আল্লাহর নগরে'র

দরজা এবং তাঁকে সেখানে দাখিল করেছেন।[৫] অগাস্টিনের এই প্রস্তাব খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব অনুসারেই। অগাস্টিনের হাবিল ঈসা মসিহ ও আদি খ্রিস্টান সাধুদের মত একজন শহিদ চরিত্র, যে এই দুনিয়ায় বিচার না পেলেও আল্লাহ তাকে নিজ রাজ্যে জায়গা দিয়েছেন। আগামবেন তাঁর পাইলেত ও ঈসা গ্রন্থে বাইবেলে বর্ণিত পাইলেত কর্তৃক ঈসার বিচারের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছেন দুনিয়ার রাজত্ব এবং আল্লাহর রাজত্বের পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার রূপক হিসেবে, যাতে দুই রাজ্যই একে অপরের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় দেয়া থেকে বিরত থাকে।[৬] এই বিরতি বজায় থাকবে শেষ জামানা পর্যন্ত, কেয়ামত ও শেষ বিচার সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত। সাধু অগাস্টিন কাবিলের হত্যাকাণ্ডকে এই দুনিয়ার সার্বভৌমত্বের অধীন নয়, বরং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীন ছেড়ে দিয়েছেন। এর যদি কোন সমাধান হয় তবে শেষ জামানাতেই হওয়ার কথা। হাবিলকে একজন শহিদ চরিত্র হিসেবে চিত্রায়ণ এবং তার খুনের বিচারকে আল্লাহর হাতে তথা শেষ বিচারের হাতে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে আরও সুস্পষ্ট অবস্থান দেখা যায় কোরআন শরিফে। আল থালাবি হাবিলের জন্য সরাসরি শহিদ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কোরআনের সুরা মায়েদায় যে হাবিলকে পাওয়া যায়, সে হাবিল ঈসা মসিহ ও গৌতম বুদ্ধের মত অহিংস চরিত্র। কাবিল যখন তাকে মারতে উদ্যত হল, তখন সে বলল–যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করো, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি (সুরা মায়েদা : ২৮)। এই দিক থেকে কোরআনের হাবিল ইহুদি মিদ্রাসের হাবিলের চেয়ে কাঠামোগতভাবেই ভিন্ন একটি চরিত্র। মিদ্রাসের হাবিল কাবিলের সাথে কুস্তি করে পরাজিত হয়ে নিহত হয়েছে, কোরআনের মত লড়াই না করেই মৃত্যুবরণ করেনি। কোরআনের হাবিল পরিষ্কারভাবেই একটি শহিদ চরিত্র। তাই সে কাবিলকে বলে–আমি চাই যে আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি দোজখিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের (জালিমদের) শাস্তি (সুরা মায়েদা : ২৯)। অর্থাৎ কোরআন অনুসারে, হাবিলের মতে কাবিল এই দুনিয়ায় শাস্তির মুখোমুখি না হলেও আল্লাহর বিচারে তার গন্তব্য হবে দোজখের আগুন। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত র‍্যাবের হাতে একরামুল হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর স্ত্রীকে র‍্যাবের সদস্যরা আল্লাহর কাছে বিচার দেয়ার জন্য বলেছিলেন বলে খবরে প্রকাশ পেয়েছিল। র‍্যাব এখানে 'আল্লাহর বিচার' বলতে যা বুঝিয়েছে তার সাথে কাবিলের হাতে হাবিলের হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিচারের পার্থক্য নেই। এর আসল অর্থ হল দুনিয়ায় বিচারের অনুপস্থিতি। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা যে অন্যায় হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দেয় তাকে অবিচার মনে হলেও মেনে নিতে বাধ্য হওয়ার যে যাতনা, তারই বহিঃপ্রকাশ 'আল্লাহর বিচারে'র আকাঙ্ক্ষা।

বৈধভাবে সহিংসতা ঘটানো এবং হত্যা করতে পারাটা সার্বভৌম ক্ষমতার সবচাইতে প্রধান ক্ষমতা ছিল হাজার বছর ধরেই। কিন্তু আধুনিক যুগে বায়োপলিটিকসের আবির্ভাবের পর থেকে এই ক্ষমতার রূপ ও কাঠামো নিয়ে আলোচনা নতুন রূপ ধারণ করেছে। মিশেল ফুকো আধুনিক রাষ্ট্রের বায়োপাওয়ার নিয়ে লিখেছেন তাঁর 'হিস্টোরি অব সেক্সুয়ালিটি (প্রথম খণ্ড)', 'সোসাইটি মাস্ট বি ডিফেন্ডেড' ইত্যাদি গ্রন্থে। ফুকোর দাবি ছিল যে আধুনিক রাষ্ট্রে জীবের জীবন, যেমন–মানুষের জীবন, সরাসরি রাজনীতির ভিত্তি ও হিসাবের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হাজার বছর যাবৎ মানুষ ছিল তেমন, যেমনটা অ্যারিস্টটল বলেছেন, রাজনৈতিকভাবে অস্তিত্ববান হওয়ার সামর্থ্য আছে এমন এক জীবসত্তা; কিন্তু আধুনিক মানুষ এমন এক প্রাণী, যার রাজনীতি জীবসত্তা হিসেবে তার অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে।[৭] তবে ফুকো বায়োপাওয়ারের যেই দিকগুলোতে বেশি জোর দিয়েছেন তা হল আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা (regulatory power) এবং শৃঙ্খলার কলাকৌশল (deciplinary mechanism)। ফুকো মনে করতেন যে আগের কালের রাজ্য বা সাম্রাজ্যের সাথে আধুনিক রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার পার্থক্য আছে। আগের কালের সার্বভৌম রাজা বা সম্রাটরা নির্ভর করতেন প্রকাশ্যে সহিংস শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে ক্ষমতা প্রদর্শনের ওপর। জনসাধারণের সামনে গিলোটিনে হত্যাকাণ্ড অথবা অপরাধীদের লাশ বা কাটা মুণ্ড প্রদর্শন করাটা এই ধরনের প্রদর্শনীমূলক সার্বভৌম ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য ছিল। আধুনিক যুগে বিষয়টা ভিন্ন। ফুকোর মতে, আধুনিক রাষ্ট্র অপরাধী তো বটেই, সকল নাগরিককেই নানা রকম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে। অপরাধীদের জন্য জেল আছে। আবার জেলখানার বাইরেও নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান নাগরিকদের শৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে কাজে লাগে। ফুকোর মতে স্কুল, মাদ্রাসা, চার্চ, মসজিদ, হাসপাতাল, পাগলাগারদ ইত্যাদিও জনগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে কাজে লাগে। এসব প্রতিষ্ঠানে সবচাইতে বেশি শেখানো হয় শৃঙ্খলা, যেহেতু পুঁজিবাদী উৎপাদনযন্ত্রের জন্য প্রয়োজন সুশৃঙ্খল তথা শৃঙ্খলাবদ্ধ নাগরিক। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজকে ফুকো নাম দিয়েছেন পেনোপটিক সমাজ। অর্থাৎ তিনি এই ধরনের সমাজকে তুলনা করেছেন 'পেনোপটিক (panoptic) জেলখানা'র সাথে। পেনোপটিক জেলখানা ছিল এক ধরনের পরীক্ষামূলক জেলখানা, যেখানে একজন মাত্র জেলার প্রত্যেক আসামির ওপর এক জায়গায় বসেই নজর রাখতে পারে, যাতে তাদের সুশৃঙ্খল রাখাটা সহজ হয়। উপযোগবাদী ইংরেজ দার্শনিক জেরেমি বেনথাম এই মডেলের জেলখানার প্রস্তাব করেছিলেন। যদিও এই ধরনের জেলখানা খুব বেশি নির্মিত হয়নি, কিন্তু ফুকো পেনোপটিক জেলখানার উদাহরণকে ব্যবহার করেছেন আধুনিক রাষ্ট্রের ডিসিপ্লিনারি এবং নজরদারিনির্ভর ক্ষমতার একটা প্যারাডাইম হিসেবে, আর এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন পেনপটিসিজম।[৮] ফুকো এই প্যারাডাইম হাজির করেছিলেন ইন্টারনেট নজরদারির যুগ শুরু হওয়ার অনেক আগে। বর্তমানে ইন্টারনেট নজরদারির যুগে এখন এই পেনোপটিক সমাজের ধারণা বোঝাটা আরও সহজ হয়েছে।

অবশ্য আগামবেন মনে করেন যে শুধু আধুনিক যুগেই নয়, বরং জীবের জীবনকে (zoe) রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসাটা সার্বভৌম ক্ষমতার অতি পুরাতন, হাজার বছরের, বলা যায় 'আদিমতম বৈশিষ্ট্য'। আর ফুকো যেখানে আধুনিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতার দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন, সেখানে আগামবেন আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন সার্বভৌমের সেই আদিম ও সবচাইতে ভয়াবহ ক্ষমতার দিকে–খুন করার ক্ষমতা। তবে আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রের খুন করার উপযুক্ত জীবনের ক্যাটাগরি তৈরি করা, তাদের নজরদারির মধ্যে রাখা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, খুন করার আগ পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করার যে ক্ষমতা বা 'বায়োপাওয়ার' তা সার্বভৌম ক্ষমতাকে এমন এক স্তরে নিয়ে গেছে, যা অতীতে আর কোন যুগে সম্ভব ছিল না। ফুকো যেখানে আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা বোঝানোর জন্য পেনোপটিক জেলখানার উদাহরণ টেনেছেন, আগামবেন সেখানে হাজির করেছেন 'কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে'র উদাহরণ। আগামবেনের মতে, ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে ইউরোপীয় সার্বভৌম শক্তিগুলো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প নামে যা আবিষ্কার করেছিল তার মধ্যেই আধুনিক

যুগের নামুস (nomos) সবচাইতে প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর মতে, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পই হল আধুনিক রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত রূপ। যদিও এই প্রকট রূপ নিয়ে তা সব সময় আত্মপ্রকাশ করে না, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র সব সময়ই একটি সম্ভাব্য কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর যদিও ইউরোপে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বিলুপ্তি ঘটেছে এবং জনগণকে খুন করার সার্বভৌম ক্ষমতা ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে আর আগের মত প্রকাশ্য নয়, কিন্তু উন্নত দুনিয়ার বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের নামুসের সবচাইতে প্রকট রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ তার উলেখযোগ্য একটি উদাহরণ। অন্তত দশ লক্ষ নাগরিক আছে এমন ভূখণ্ডের মধ্যে জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান পাঁচ নম্বরে। তবে এই পাঁচ দেশের মধ্যে বর্তমান দুনিয়ায় চলাচলের স্বাধীনতার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান দুই নম্বরে। এক নম্বরে আছে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের নামুস যেখানে সবচাইতে দীর্ঘস্থায়ী ও প্রকট রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে অন্ততপক্ষে কোটিখানেক জনসংখ্যা আছে এমন দেশের মধ্যে বাংলাদেশেই মানুষের ঘনত্ব সবচাইতে বেশি, আবার আমাদের দেশের মানুষের চলাচলের স্বাধীনতাও দুনিয়ায় সবচাইতে কম স্বাধীনতাসম্পন্ন মানুষের কাতারে পড়বে। মিয়ানমার ও ভারত থেকেও বাঙালি ও মুসলমান ক্যাটাগরিতে ফেলে বাংলাদেশে আরও মানুষ ঢোকানো হচ্ছে। অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশের তিন দিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে এবং সীমান্তে মানুষ খুন করে এদেশের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প রূপটা আরও ভালভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

বর্তমান দুনিয়ায় উন্নত দেশগুলোর বায়োপাওয়ার বোঝাতে যেখানে পেনোপটিকসের উদাহরণ ভাল খাটে, অনুন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে খাটে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের উদাহরণ। কিন্তু বাংলাদেশের মত দেশের পরিস্থিতি বোঝার জন্য এ দুই রূপকেই বিবেচনা করার দরকার আছে। সেই সাথে ইন্টারনেটের এই যুগে রেগুলেটরি মেকানিজম আর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের নামুস টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যে সামাজিক সম্মতি উৎপাদন তথা হেজিমনির ওপর কতটা নির্ভরশীল তা বিবেচনায় না নিলে এই জটিল পরিস্থিতি বোঝা যাবে না। বন্দুকযুদ্ধ ও ক্রসফায়ারের নামে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যত খুন হয়েছে, তেমন প্রতিটা খুনের ক্ষেত্রে সমাজের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন অংশের সম্মতি উৎপাদন করা গেছে। ইন্টারনেট প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন অংশ আপন উদ্যোগেই বিচারপতির ভূমিকায় হাজির হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পক্ষে রায় দিয়েছে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ বিভিন্ন সময়ে ক্রসফায়ারে মানুষ মারার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। কেউ চান মাদক ব্যবসায়ীদের ক্রসফায়ারে মারা হোক, কেউ চান জঙ্গিদের ক্রসফায়ারে মারা হোক, কেউ চান ধর্ষকদের ক্রসফায়ারে মারা হোক, কেউ চান নাস্তিকদের মেরে ফেলা হোক। উল্লেখযোগ্য একটি উদাহরণ হতে পারে বাবুল আক্তারের স্ত্রীর হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের সুরাহা এখনও হয়নি, বরং এর রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। অথচ যখন এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল তখন পুলিশ, মেইনস্ট্রিম মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া মিলে একরকম রায় দিয়ে দিল যে জঙ্গিরাই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। পুলিশ তখন রণহুংকার দিতে লাগল, আর প্রগতিশীল ফেসবুক প্রজন্ম আবির্ভূত হল চিয়ার লিডারের ভূমিকায়। তাতে প্রায় বিনা প্রতিবাদে ও জনসমর্থন নিয়ে ব্যাপক হারে পুলিশি নির্যাতন, গ্রেপ্তার বাণিজ্য ও বন্দুকযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেল তখন। অভিজিৎ থেকে শুরু করে জুলহাজ পর্যন্ত সকল হত্যাকাণ্ডের দায় নিয়ে একজনকে হত্যাও করা হল। সাম্প্রতিক সময়ে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে মানুষ হত্যাও ব্যাপক জনসমর্থন নিয়েই সংগঠিত হচ্ছিল। বছরের পর বছর ধরে মিডিয়ায় নানা রকম তালিকা প্রকাশ করে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় মাদক ব্যবসায়ীদের বিমানবিকীকরণের মাধ্যমে এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। একরাম হত্যাকাণ্ডের অডিও প্রকাশ পাওয়ার পরই এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মানুষ কয়েক দিনের জন্য সোচ্চার হয়েছিল। কিন্তু তারপর আরও অনেকেই মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে নিহত হয়েছেন। শাহজাহান বাচ্চুর হত্যাকাণ্ডের পর জেএমবিকে দায়ী করে একজনকে জঙ্গি হিসেবে হত্যা করা হয়েছে, সেই হত্যার পক্ষেও প্রগতিশীল বলে পরিচিতদের একাংশকে সমর্থন দিতে দেখা গেছে অথবা প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়নি।

এই রকম সব সময়ই কোন না কোন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দিতে সমাজের একাংশকে তৎপর দেখা যায়। কিন্তু সবাই আবার চান যে শুধুমাত্র কিছু মানুষকেই যাতে ক্রসফায়ারে মারা হয়, সবাইকে যাতে হরেদরে না মারা হয়। অর্থাৎ তাঁরা চান যে ক্রসফায়ারে মানুষ মারাটা একটা 'ব্যতিক্রম বা জরুরি অবস্থা' হিসেবেই থাকুক, স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত না হোক। তাঁরা চান যে আইন বা নিয়মের ব্যতিক্রম শুধু কিছু লোকের ওপরই প্রয়োগ হোক, যাদের তাঁরা বিপজ্জনক মনে করেন অথবা পরিচয় কিংবা সহানুভূতির অভাবে যাদের বৈচারিক প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থন ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার নিয়ে তাঁদের কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু যারা তাঁদের পরিচিত ও যাদের অকালমৃত্যু তাঁরা মেনে নিতে পারেন না, তাঁরা চান তাদের ক্ষেত্রে আইন চলুক সঠিক নিয়মে, নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটুক। এই সমাজ বিচার চায়, আবার কিছু মানুষের ক্ষেত্রে চায় বিচারের ব্যতিক্রম। এ এক আত্মঘাতী সামাজিক 'এপোরিয়া' (Aporia)। এইভাবে বিভিন্ন পক্ষের মানুষ কোন না কোন ক্যাটাগরির মানুষের ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম সমর্থন করার ফলে 'ব্যতিক্রম অবস্থা'ই বাংলাদেশে বর্তমানে নিয়মে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতি বোঝার জন্য আমরা ওয়াল্টার বেনিয়ামিনের সেই বিখ্যাত উক্তির স্মরণ নিতে পারি। বেনিয়ামিন লিখেছিলেন সেই সময়ে, যখন ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটেছিল, যখন ইহুদিদের দিয়ে শুরু করে একের পর এক বিভিন্ন ক্যাটাগরির মানুষ তৈরি করা হচ্ছিল, যাদের ক্ষেত্রে 'নিয়মের ব্যতিক্রম' করা যায়, যাদের হত্যাযোগ্য পশুতে পরিণত করা যায়। বেনিয়ামিন লিখেছিলেন–যেই 'ব্যতিক্রম অবস্থায়' আমরা বসবাস করিতেছি তাহাই নিয়ম।[৯] সুতরাং এই নিয়মের মধ্যে বাংলাদেশের সকল মানুষই, যারা কোন না কোন ক্ষেত্রে বিচারকের ভূমিকায় হাজির হয়ে কারও না কারও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড জায়েজ করে, তারাও সব সময়ই বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যাযোগ্য জীবনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যেই বসবাস করে। এ এক জটিল পরিস্থিতি। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বাহিনী তো বটেই, সমাজ নিজেই নানা রকম রেগুলেশনের পক্ষে প্রচার চালিয়ে একটা পেনোপটিক সমাজে পরিণত হয়েছে। এই সমাজের ব্যক্তিরা নিজেদের ওপর

বন্দুকযুদ্ধ ও ক্রসফায়ারের নামে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যত খুন হয়েছে, তেমন প্রতিটা খুনের ক্ষেত্রে সমাজের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন অংশের সম্মতি উৎপাদন করা গেছে। ইন্টারনেট প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন অংশ আপন উদ্যোগেই বিচারপতির ভূমিকায় হাজির হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পক্ষে রায় দিয়েছে।

সেলফ রেগুলেশন আরোপ করে এবং অন্যদের তা করতে উৎসাহিত করে, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ানির্ভর অ্যাকটিভিজমে অতিনির্ভরশীল হয়ে সদা সার্ভেইলেন্সে অন্তর্ভুক্ত জীবনে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে সমাজের নির্যাতিত বিভিন্ন বর্গের মানুষদের দেখা যায় পপুলিস্ট ডানপন্থী রাজনৈতিক আইডিওলজি ও প্রোপাগান্ডা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাজিবাদী, ফ্যাসিবাদী, তাকফিরিদের মত নিজেদের বাইরের অন্য বিভিন্ন নির্যাতিত বর্গের মানুষদের রাজনৈতিক ও মানবাধিকার অস্বীকার করে বিভিন্ন হত্যাযোগ্য ক্যাটাগরির জীবন উৎপাদনে তৎপরতা চালাতে, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের পাহারাদারে পরিণত হতে। বাংলাদেশের প্রায় সবাই এখন একেকজন সার্বভৌম এবং একেকজন হোমো স্যাকের। যুগপৎভাবেই এরা সবাই হাবিল, এবং কাবিলও বটে।

সাধু অগাস্টিন যে হাবিল ও কাবিলকে হাজির করেছেন, তাদের মধ্যে একটা মিল আছে। এই মিল তাদের 'ব্যান' বা বহিষ্কারে। একজন দুনিয়ার রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত, আরেকজন খোদার রাজ্য থেকে। দুজন একসাথে আমাদের সামনে হাজির করে আগামবেনের বিবেচনায় হোমো স্যাকের ও সার্বভৌমের জীবন, যার সাথে দুনিয়াবি ও খোদায়ি– এ দুই আইনের সম্পর্কই বহিষ্কার বা ব্যানের সম্পর্ক। আগামবেনের মতে, হোমো স্যাকের এবং সার্বভৌম– এ দুই জীবনের মধ্যে কাঠামোগত মিল আছে, আর এই মিল দুই জীবনেরই খোদায়ি ও দুনিয়াবি আইন থেকে বহিষ্কারের জীবন হিসেবে। আগামবেনের এই বক্তব্য সরলভাবে নেয়াটা সমস্যার, কারণ এতে আল্লাহর আইনে সার্বভৌমের এবং সার্বভৌমের আইনে জনগণের জীবনের বহির্ভূত হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জটিল সমীকরণ বাদ থেকে যায়। কিন্তু এইটুকু বলা যায় সহজেই যে হোমো স্যাকের এবং সার্বভৌম, হাবিল ও কাবিল এ দুই ধরনের জীবনই বিরাজ করে সম্ভাব্য আইনের বাইরের জীবন হিসেবে, নিয়মের মধ্যে তারা অন্তর্ভুক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে উন্মোচিত জীবন হিসেবে। আগামবেনের ভাষায়, সার্বভৌম হল সে, যার কাছে সকল মানুষই সম্ভাব্য হোমো স্যাকের, আর হোমো স্যাকের হল সে, যার কাছে সকল মানুষই সম্ভাব্য সার্বভৌম।[১০] আগের কালে যেমন শুধুমাত্র একজন রাজা বা সম্রাটেরই একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সার্বভৌম হওয়ার অধিকার ও ক্ষমতা ছিল, এখন আর তেমনটা নয়। সার্বভৌমত্ব এখন একটা জাতীয় বা সামাজিক ব্যাপার, কবির ভাষায়–আমরা সবাই রাজা। উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে এই পরিস্থিতির সামাল দেয়া হয়েছে কাউকেই রাজার ক্ষমতা না দেয়ার চেষ্টার মাধ্যমে, অথবা কনস্টিটিউশনাল মনার্কির মাধ্যমে রাজা তথা সার্বভৌমকে একজন প্রতীকে পরিণত করার মাধ্যমে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো কিছুটা সামন্ত, কিছুটা আধুনিক সমাজে এই পরিস্থিতি হাজির হয়েছে এর সবচাইতে ভয়ংকর রূপ নিয়ে। একদিকে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবারের সদস্যরা সার্বভৌম রাজাদের মতই ক্ষমতা চর্চা করেন, তেমনি প্রায় প্রতিটা নাগরিকই নিজের সার্বভৌমত্বের সবচাইতে ভয়ংকর ক্ষমতাটির চর্চা করতে উন্মুখ হয়ে থাকে–হত্যা করা বা হত্যার বৈধতা দেয়ার ক্ষমতা। থমাস হবসের পরিভাষা ব্যবহার করলে এই পরিস্থিতিকে আইনের শাসনের বদলে 'স্টেট অব নেচার' বলা যেতে পারে, যেখানে সবাই সবার সাথে যুদ্ধে রত। তবে আগামবেন বলবেন যে আসলে তা নয়, বরং এ হল সেই পরিস্থিতি, যেখানে সবার জীবনই সবার কাছে উন্মুক্ত, বা হোমো স্যাকের।[১১] এবং এই পরিস্থিতির সুবাদেই, এবং সবার সমর্থন নিয়েই পেনোপটিক জেলখানা ও কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পরূপী রাষ্ট্রযন্ত্র ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

আগামবেন ব্যান বা বহিষ্কারের যে ধারণা হাজির করেন রাষ্ট্রের সাথে সার্বভৌম এবং নাগরিকের সম্পর্ক বোঝাতে তার জন্য বাংলা 'বন্ধ' শব্দটি খুবই কার্যকর। ইংরেজিসহ বিভিন্ন জার্মানিক ভাষায় 'ব্যান' (ban) যে শব্দটা আছে, আর বাংলা 'বন্ধ'–এ দুই শব্দের উৎস মনে হয় এক। বন্ধ শব্দটি যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়, আবার এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও শব্দটির একটা সাধারণ অর্থবোধক কাঠামো পাওয়া যাবে। প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হিসেবে 'দরজা বন্ধ' নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে। আপনি বন্ধ করলেন দরজা, কিন্তু কারও জন্য তো তা বন্ধ হল। মানে যে আছে দরজার বাইরে তার মুখের ওপরেই তো বন্ধ করলেন দরজাটা। এটা ঘরের দরজা হতে পারে অথবা হৃদয়ের দরজা। আবার আইনের দরজাও হতে পারে। এর সাথে দরজার বাইরে যে আছে তার সম্পর্ক 'বহিষ্কারে'র সম্পর্ক। অর্থাৎ বন্ধ শব্দটি এখানে বহিষ্কারের প্রতিনিধিত্ব করে। দরজা বন্ধ করে কাউকে ঘর (অথবা হৃদয় অথবা আইন) থেকে বহিষ্কার করার পাশাপাশি কিন্তু আবার আপনি নিজেকেও নিজে একটা জায়গার মধ্যে আবদ্ধ করলেন। অথবা ঘরটা কিন্তু হতে পারে একটা জেলখানা, কিংবা একটা কনসেন্ট্রেসশন ক্যাম্প। 'দরজা বন্ধ' করা তখন আবদ্ধ করার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করার ঘটনা। বন্ধ করা তাই বহিষ্কার বা বহির্ভূত করা এবং আবদ্ধ ও অন্তর্ভুক্ত করা–এ দুই ঘটনাই হতে পারে। একই সাথে। বন্ধ শব্দের অর্থ যুক্ত করাও বটে, বন্ধন ক্রিয়া পদ দিয়ে যা বোঝানো হয়। অর্থাৎ এই শব্দ দিয়ে একই সাথে বহির্ভূত ও অন্তর্ভুক্ত করা–এ দুই ধরনের ঘটনাই বোঝানো যায়। 'বন্ধন' ও 'আবদ্ধ'–এ দুইটা শব্দের সাথেই ইংরেজি অ্যাবান্ডন (abandon) শব্দটির মিল পাওয়া যায়। বন্ধ শব্দের মধ্যে তাই একই সাথে 'বহির্ভূত করা' ও 'অন্তর্ভুক্ত করা'–এ দুই অর্থ একসাথে শামিল আছে। বন্ধ শব্দটির আরেক অর্থ অবিচ্ছেদ। বন্ধ শব্দটি তাই অবিচ্ছেদের এলাকা (zone of indistinction) নির্দেশ করে। 'দরজা বন্ধ' করার ঘটনায় বন্ধ শব্দটি তাই বহির্ভূত ও অন্তর্ভুক্তের অবিচ্ছেদের এলাকা নির্দেশ করে। আপনি যখন দরজা বন্ধ করবেন তখন আপনার দাঁড়াতে হবে এই অবিচ্ছেদের এলাকায়ই, বাংলা ভাষায় যাকে বলে দোরগোড়া। ইংরেজিতে threshold। আগামবেনের মতে, সার্বভৌম ক্ষমতা বিরাজ করে দোরগোড়ায়, অবিচ্ছেদের এলাকায়। সেই অবিচ্ছেদের এলাকায় যেখানে আইনি ও বেআইনি, অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভূত একসাথে বিরাজ করে। ফলে আপনি যখন সার্বভৌমের মত আচরণ করবেন, যখন আপনি কারও (মাদক ব্যবসায়ী, জঙ্গি ইত্যাদি) মুখের ওপর আইনের দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাবেন, তখন এই দোরগোড়াতেই আপনার গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আর দোরগোড়া থেকে দরজার বাইরের এলাকাটা খুব দূরের নয়, এবং যে কোন সময় আমাদের সমাজে নিজেকে সার্বভৌম মনে করা যে কেউ আপনাকে অন্য কোন ক্যাটাগরিতে ফেলে দোরগোড়া থেকে ধাক্কা দিয়ে আইনের দরজার বাইরে ফেলে দিতে পারে। দরজাটা আপনার মুখের ওপর বন্ধ করে দিতে পারে। দোরগোড়া থেকে ঘর ও বাহির কোনটাই দূরের নয়, বরং দোরগোড়াতেই এ দুইয়ের শুরু। আমাদের ঘরের জন্য, মানে বাংলাদেশের জন্য কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের রূপকটাই সবচাইতে ভাল খাটে। মজার ব্যাপার, অথবা ট্র্যাজেডিও বলা যেতে পারে, যেহেতু এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কিছু কিছু মানুষ নিজেদের সর্বদা আবিষ্কার করে সেই দোরগোড়ায় যেখানে দাঁড়িয়ে এরা কিছু মানুষকে বহিষ্কারের মাধ্যমেই নিজেকে এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, যেখানে তার জীবন সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত থাকে 'আবদ্ধ' হিসেবে, যা বহিষ্কারের মাধ্যমে বহির্ভূত হওয়ার চাইতে আলাদা কিছু নয়। শেখ হাসিনা, যাঁর মধ্যে বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতা বর্তমানে সবচাইতে প্রকট রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তিনি কোন দিন তাঁর অবস্থানটা (দোরগোড়ায়) বুঝতে পারবেন কি না তা জানি না। কিন্তু তার চাইতে জরুরি চিন্তা,

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম, যারা শেখ হাসিনার মতই আচরণ করে, তারা নিজেদের অবস্থানটা বুঝতে পারবে কি না।

মিদ্রাস, মিশনা কিংবা সাধু অগাস্টিনের সাথে কোরআনে কাবিলের হাতে হাবিলের হত্যাকাণ্ড বিবেচনার কিছু পার্থক্য আছে। যদিও কোরআনেও কাবিলকে চিত্রায়িত করা হয়েছে অনুশোচনাকারীদের (নাদিমিন) অন্তর্ভুক্ত হিসেবে এবং আল্লাহ তাকে অন্তত নিজ ভাইকে কবর দেয়ার জন্য সহানুভূতিশীল হয়ে দিকনির্দেশনা পাঠিয়েছেন। কিন্তু কোরআনে খুব পরিষ্কার ভাষায়ই বলা হয়েছে যে হাবিলকে হত্যা করার মাধ্যমে কাবিল 'ক্ষতিগ্রস্ত'দের (খাসিরিন) অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। সেই সাথে কোরআনের কাহিনিটি শেষ হয়েছে সেই বিখ্যাত লাইন দিয়ে–যে একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল, এবং যে কারও জীবন রক্ষা করল, সে যেন সব মানুষের জীবনই রক্ষা করল। অর্থাৎ একজন মানুষেরও বিচারবহির্ভূত হত্যাকে বৈধ করার জন্য যে সার্বভৌম হিসেবে হাজির হয়, সে আসলে গোটা মানবজাতিকেই উন্মোচিত করে মৃত্যুর সামনে, তার নিজের জীবনও যার অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে একজন নিরপরাধের জীবন রক্ষাও আমাদের গোটা মানবজাতির নাজাতের রাস্তাটি প্রশস্ত করে। এই শিক্ষাটি মাথায় রাখলে হয়ত আমরা সার্বভৌমত্বের কদর্য রূপ অতিক্রম করে নতুন রাজনীতির ভিত্তি স্থাপন করতে পারব।

পারভেজ আলম: লেখক, ব্লগার

ই-মেইল: stparvey@gmail.com

টীকা

১) Robert C. Gregg. Shared Stories, Rival Tellings; Early Encounters of Jews, Christians, and Muslims. Oxford Univeristy Press, 2015, pp. 93, 94

২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৫

৩) Giorgio Agamben. HOMO SACER; Sovereign Power and Bare Life. Originally published as Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Giulio Einaudi editor s.p.a, 1995. P. 19

৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২

৫) Julian Andres and Gonzaley Holguin. Cain, Abel, and the Politics of God: An Agambenian Reading of Genesis 4:1-16, Routledge, 2018, p. 53

৬) Giorgio Agamben. Pilate and Jesus. Translated by Adam Kotsko. Stanford university press, 2015

৭) Michel Foucault, The History of Sexuality: Volume One, Vintage Books, 1990, p. 143

৮) Michel Foucault. Discipline and Punishment. Vintage Books, 1995

৯) Giorgio Agamben. The Messiah and the Sovereign: The problem of Law in Walter Benjamin. Potentialities; Collected Essays in Philosophy, Ed and Trans, Daniel Heller–Roayen. Stanford University Press, 1999, p. 162

১০) Giorgio Agamben. HOMO SACER; Sovereign Power and Bare Life. Originally published as Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Giulio Einaudi editor s.p.a, 1995. P. 56

১১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭০

তথ্যসূত্র

Giorgio Agamben. HOMO SACER; Sovereign Power and Bare Life. Originally published as Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Giulio Einaudi editor s.p.a, 1995

Giorgio Agamben. Pilate and Jesus. Translated by Adam Kotsko. Stanford university press, 2015

Giorgio Agamben. The Messiah and the Sovereign: The problem of Law in Walter Benjamin. Potentialities; Collected Essays in Philosophy, Ed and Trans, Daniel Heller–Roayen. Stanford University Press, 1999

Julian Andres and Gonzaley Holguin. Cain, Abel, and the Politics of God: An Agambenian Reading of Genesis 4:1-16, Routledge, 2018

Michel Foucault. Discipline and Punishment. Vintage Books, 1995

Michel Foucault. The History of Sexuality: Volume One, Vintage Books, 1990

Robert C. Gregg. Shared Stories, Rival Tellings; Earlz Encounters of Jews, Christians, and Muslims. Oxford Univeristy Press, 2015

nvwej I Kvwej, cq`v‡qk, evsjv evB‡ej,YouVersion. https://www.bible.com/bible/95/GEN.4.MBCL . Accessed 9 july, 2018

m~iv Avj gv‡q`v. evsjv AbjvBb †KviAvb kwid, Quraan Shareef, http://www.quraanshareef.org/Surah-Al-Maidah. Accessed 9 july, 2018

সংগৃহীত